বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধকথা, বৌদ্ধযুগ : রাজনীতি, মতাদর্শ

উনিশ বিশ শতকের ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব বাংলা উপন্যাসে খেয়াল করলে দেখা যাবে- সব থেকে চর্চিত এবং জনপ্রিয় ধরণটি হল, হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্মাবলম্বী মানুষ; আর প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের বাইনারিতে তার চর্চা এবং আলোচনা। কিন্তু ভারতবর্ষে উদ্ভূত এবং একটি বিরাট কালপর্ব জুড়ে বিরাজমান বৌদ্ধযুগ এবং বৌদ্ধধর্ম বাংলা উপন্যাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার চর্চা বেশ কম। এই জিজ্ঞাসা থেকেই আমাদের গবেষণা প্রকল্পের অবতারণা। এই বিষয়ক উপন্যাস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, মোটেই তার সংখ্যা নগণ্য নয়। ফলে শুধু পাঁচ দশটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ ও তার আলোচনায় না গিয়ে, কিছু প্রবণতা এবং চিহ্ন আমরা নির্ণয় করেছি। এই প্রবণতা নির্ণীত হয়েছে দেশ-কালের রাজনীতির সাপেক্ষে। তার প্রভাবগুলি, বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে আমাদের গবেষণা এগিয়েছে।

ভারতবর্ষে ধর্ম দর্শনের মূল এবং লোকায়ত ধারায় বহু ধর্ম দর্শন প্রস্থানের উল্লেখ, প্রভাব এবং ধর্মাবলম্বী মানুষের কথা পাই। কখনও কখনও এই দর্শন প্রস্থানগুলি একে অপরের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে থাকে যে তাদের বৈশিষ্ট্য 'নির্দিষ্ট' করে নির্ধারণ করা মুশকিল হয়। বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মে যেমন, তাঁর আগে বর্তমান ধর্ম-দর্শনের প্রভাব আছে তেমনি বুদ্ধের পরবর্তীকালে মূল ধারা ও লোকায়ত ধারার সঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম মিশে বহুভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। এইসব গবেষণা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, রাধাকৃষ্ণন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, আম্বেদকর প্রমুখদের আলোচনায় পাবো। শুধু ভারতীয় পণ্ডিতরাই নন বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন, সহমত হয়েছেন; মতভেদও রয়েছে। আমাদের গবেষণায় এই দর্শন নিয়ে আমরা তেমন আলোচনা করিনি। উপন্যাসের আলোচনায় যতটুকু প্রসঙ্গ এসেছে, উল্লেখ করেছি মাত্র; ঔপন্যাসিকদের ওপর প্রভাবকে, বিশ্লেষণ করেছি। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতিকে-

'ফিক্সনে' (উপন্যাসে) তাঁরা কীভাবে নির্মাণ করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করে আমরা তাঁদের অবস্থানকে পড়তে চেয়েছি।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধকালকে ব্যবহার করে উনিশ বিশ শতকে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার, ‘বীর নায়ক', বীরের উপযুক্ত 'সতী-সঙ্গিনী', ‘ধর্মীয় প্রতিপক্ষ' নির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যই ছিল এই উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় ঝোঁক। স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বাঁক বদল করেছে, সমকালীন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচনা করার জন্য লেখকরা বৌদ্ধকাল, বুদ্ধকথা, ধর্ম-দর্শনকে, মেটাফর বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ তৈরি করেছেন; তাকে প্রভাবিত করেছেন এবং প্রভাবিত হয়েছেন।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি- প্রাচীন চর্যাগানের এই লাইনকে বুদ্ধিজীবীরা 'বাঙালির আত্মপরিচয়ের' সঙ্গে যুক্ত করেছেন; চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি। ভুসুকু বৌদ্ধ সহজযানী, কবি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকরাও বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, বৌদ্ধ-উপাদানকে বিচিত্র পদ্ধতিতে 'বাঙালির আত্মপরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইতিহাস, গবেষণায় জানা যায়, এটাই সঠিক পদ্ধতি; শুধু বৌদ্ধ নয় আরও নানান ধর্মের প্রভাব এই 'আত্মপরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু 'একরৈখিক, অভিজাত, মান্য, হিন্দুপ্রধান আত্মপরিচয়' নির্মাণ প্রচেষ্টায় গবেষণা, ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়ে, বদলে দিয়েও 'কল্পকাহিনি (উপন্যাস)' নির্মিত হয়েছে। ফলে সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে, পরিবর্তিত রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের নির্মাণ-রাজনীতিরও বিবর্তন হয়েছে। এই বিবর্তিত রাজনীতির ধারাকেই আমরা আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কেন সব উপন্যাসই রাজনৈতিক উপন্যাস; তাতে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ই উপস্থাপিত এবং পুনর্নির্মিত হয়। আমরা বুদ্ধকথা ও বৌদ্ধযুগ ধর্ম দর্শন কেন্দ্রিক উপন্যাসে এই অভিপ্রায় গুলিকে চিহ্নিত করবো।

বিশ শতকের রাজনৈতিক পালাবদল- উপনিবেশ এবং উত্তর উপনিবেশ পর্ব, দেশভাগ, স্থানচ্যুতি, ভাষা, লিঙ্গ, আত্ম এবং অপর পরিচয়ের- রাজনীতি, ক্ষমতার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে নির্মাণ এই সময়ের কথাসাহিত্যে সুস্পষ্ট, এনিয়ে দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই। বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধকাল- আসলে, সংঘাত, পরিবর্তন, ক্ষমতার অনুসরণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিহ্ন হিসেবেই বহু বৈচিত্রে, জটিলতায় ব্যবহৃত।

প্রসঙ্গ অনুযায়ী অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের ভাবনা, সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা, উপন্যাসের বিভিন্ন প্রবণতাগুলি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ শতকের কালপর্বে অঙ্কের নিয়মে সীমাবদ্ধ থাকতে পারিনি। প্রবণতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার আগে এবং পরের সময়কাল, আলোচনায় এসেছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে, ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়, উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বুদ্ধকথা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগের চর্চা।

উপনিবেশপর্বে ভারতবর্ষে, একেবারে প্রথম দিকে ইংরেজদের অনুপ্রেরণায়, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অনুসরণে, ব্যক্তিগত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে বাঙালি, বাংলা ভাষায় এই বিষয়ক গবেষণা এবং চর্চায় মনোনিবেশ করে। এই অধ্যায়ে, তার একটা সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী প্রাথমিক ভাবে হাজির করেছি। আলোচনাসূত্রে দেখেছি, এই প্রক্রিয়া একমুখী এবং সরলরৈখিক নয়, বেশ জটিল। ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় শুরু হলেও এর বাঁকবদল ঘটে, ক্ষমতা বিরোধী জাতিয়তাবাদী স্বর নির্মাণে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়। ইতিহাসবিদ গবেষকরা আবিষ্কার করেন, বৌদ্ধকাল জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চায়, কৃষি, বাণিজ্যে, শিল্পভাবনায়, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে ‘গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়’ ছিল। ফলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি, সাহিত্যে বিভিন্নভাবে এই কালকে ব্যবহার করার অনুপ্রেরণা পায়।

আবার সমস্যা দেখা যায়, অতীত গৌরবে বৌদ্ধধর্মকে মান্যতা দিলে হিন্দুধর্ম-প্রাধান্যের কী হবে? ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধরণ অনুযায়ী ধর্মীয় বাইনারি তৈরিতেও চেনা হিন্দু-মুসলমান ছকের পাশাপাশি হিন্দু-বৌদ্ধ ছক ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছক ব্যবহারে বাঙালির মধ্যে একটি 'কিন্তু' থেকে গেছে বৌদ্ধধর্ম বহিরাগত কী না সেই প্রশ্নে। যত সহজে ইসলামধর্মকে তাঁরা 'বহিরাগত এবং বিতাড়নযোগ্য' বলে দাগিয়ে দিতে পারছিলেন; বুদ্ধ জন্মভূমি এবং বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে, বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে এই কাজ তত সহজ ছিল না। ফলে সেই দ্বন্দ্ব, জটিলতা তৈরি করেছে, যার ছাপ পড়েছে সাহিত্যে।

আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অংশ, না কী তার থেকে পৃথক; বুদ্ধ অবতার না 'অসাধারণ মানুষ'; গোঁড়া হিন্দত্ববাদ, লিবেরাল, স্যেকুলার এবং মানবতাপন্থী ধর্ম দর্শনে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের গ্রহণোগ্যতা ঠিক কেমন; এই সমস্ত বিতর্কের সূত্রপাত কী উনিশ বিশ শতকেই; না কী আরও অতীতে প্রোথিত তাঁর বীজ?

আমরা গোটা অধ্যায় জুড়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে উনিশ বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ নন-ফিক্সন এবং ফিক্সনের 'পাঠ' কে ব্যবহার করেছি। এই দ্বন্দ্ব গুলি লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। সেগুলি নিয়ে চলতে থাকে জটিল, সচেতন বিতর্ক, দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ প্রচেষ্টা-প্রকল্প। সীমাবদ্ধ মান্য-কেন্দ্রিক ঝোঁককে লেজিটিমাইজ বা ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্টা, পাঠকের ভাবনা, রুচি, চাহিদাকে 'ম্যানিউপুলেট' করার চেষ্টা, প্রভাবিত হওয়া এবং প্রভাবিত করতে চাওয়ার সাহিত্যিক-রাজনৈতিক সমীকরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মদের বিভিন্ন উদ্যোগ, নবীনচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রামদাস সেন, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের বিভিন্ন রচনা প্রসঙ্গত ব্যবহার করেছি। মূলত এই সময়ের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের

প্রবণতাগুলির বিবর্তন। ফলে উপন্যাস প্রথমেই আলোচনা না করলেও আমাদের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাগুলি এই অধ্যায়ে আমরা চিহ্নিত করতে চেয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়, কবির ধর্ম: বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা, রাজনীতি, মতাদর্শ।

আমাদের গবেষণার পরিসরকে উপন্যাসের সংরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি, একথা ঠিক। কিন্তু এই বিষয়ের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। প্রথম অধ্যায়ের অনুসরণেই এই অধ্যায়টির পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রকল্পকে বিশ্লেষণের জন্য আলাদা পরিসরের প্রয়োজনেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব, বুদ্ধকথা, বুদ্ধযুগ, ধর্ম-দর্শন নিয়ে কোনো উপন্যাস না লিখলেও, বাকি সমস্ত সংরূপেই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন- কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, চিঠিতে, বক্তৃতায়, নাটকে। তিনি এবিষয়ে কোনো উপন্যাস লেখননি- শুধু এই যুক্তিতে তাঁকে, তাঁর ভাবনাকে কিছুতেই বাদ রাখা চলেনা। কারণ বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; গ্রহণ না করলেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথকে কোনো নির্দিষ্ট সংরূপে বাঁধা যায় না, তাই হয়ত, রাধাকৃষ্ণন তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন- “দ্য রিলিজিয়ন অফ আন আর্টিস্ট”। কিন্তু কবি নিজেই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম, জীবনদেবতার-ভাবনার কথা বলতে গিয়ে, তার নাম দিয়েছেন - “দ্য পোয়েট’স রিলিজিয়ন”। এই প্রবন্ধ অনুসরণেই, অধ্যায়ের নামকরণ।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধধর্ম, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ সংক্রান্ত ভাবনা দ্বারা শুধু প্রভাবিতই নন, তিনি এই ভাবনাগুলিকে নির্মাণ করেছেন উনিশ বিশ শতকের সমকালীনতার প্রেক্ষিতে। তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের তত্ত্বে উপনিষদের ‘ব্রহ্ম’, ব্রাহ্মধর্মের ‘একমেবোদ্বিতীয়ম ঈশ্বর’, ভক্তি আন্দোলনের, চৈতন্যসহ অন্যান্যদের প্রেমধর্ম, সহজিয়া-বাউল-সুফীদের, ‘মনের মানুষ, ব্যক্তিগত ঈশ্বর’ তো আছেই, তার সঙ্গে মিশে আছে “সর্বশ্রেষ্ঠমানব বুদ্ধদেব” ও তাঁর ধর্ম-দর্শন। সব মিলে তৈরি করেছে ‘কবির ধর্ম’।

তাঁর লেখায় খ্রিষ্ট, দাদূ, চৈতন্যের কথা এসেছে; কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন বুদ্ধকেই। কারণ বুদ্ধ, এদের সকলের থেকেই প্রাচীন; তাঁর দর্শন, বৌদ্ধধর্মের এতকাল ধরে স্বমহিমায় টিকে থাকা, নিজ উৎপত্তি-দেশ থেকে সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রধান হয়ে ওঠা, তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে গ্রহণ করেননি। তিনি তাকে সংস্কার করেছিলেন, সম্পাদনা করেছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে এই ব্যক্তিগত রূপদানকে তিনি জগতের দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সম্পাদনার ধাপগুলিকেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

বঙ্কিমের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ধর্ম বিষয়ক তর্কে বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। ঠাকুরবাড়ির বুদ্ধকথা চর্চার উত্তরাধিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। তাঁর বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় বৌদ্ধবিহারগুলির প্রভাব, ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্যে বুদ্ধের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধসাহিত্য- সম্পাদনা, অনুবাদ, মৌলিক রচনা, গবেষণার বিবরণ- ইত্যাদি মূল ঝোঁক গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধকথা নির্মাণের মৌলিকতাগুলি এই অধ্যায়ে খুব বেশি আলোচিত হয়নি; কারণ বহু গবেষক এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিছু মৌলিক প্রবণতা উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। গোটা বিশ্বের দরবারে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের প্রতিনিধি, 'কবি' হয়ে উঠলেন, তিনি বুদ্ধকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন, ঐক্যের- মানবতার বার্তা দিতে। বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রবন্ধে তাঁর মতামতগুলি আমরা পাই। সমসাময়িক কালে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন বিষয়ক যে চর্চা হচ্ছিল তার থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রকল্প স্বতন্ত্র।

তৃতীয় অধ্যায়, আধুনিকের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস': 'আত্মপরিচয়' নির্মাণের অভিপ্রায়।

এই অধ্যায়ে সরাসরি উপন্যাসের মধ্যে উপরোক্ত প্রবণতা গুলি খুঁজে দেখেছি। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রবণতাগুলি যেমন এই উপন্যাসগুলিকে প্রভাবিত করেছে; তেমনই আছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। ভাষা,

আত্ম এবং 'অপর'এর আত্মপরিচয় নির্মাণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্থানচ্যুতি আশ্রয়চ্যুতির যন্ত্রণা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা, হেজিমনি ও ক্ষমতার পক্ষ এবং বিরুদ্ধ স্বর নির্মাণ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবতাবাদী ধর্মের দ্বন্দ্ব, বাজার এবং চাহিদা অনুযায়ী সাহিত্য-পণ্যের নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নকে সামনে রেখে, উপন্যাসের গল্পের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধকাল বুদ্ধকথাকে ব্যবহার করে, সমকালকে নির্ধারণ করার, সমালোচনা করার, উপস্থাপন করার বিভিন্ন প্রকল্প এই সময় জুড়ে তৈরি হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সত্যেন সেন, শওকত আলি, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সমরেশ মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল প্রমুখের উপন্যাস প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়, থেরীগাথা থেকে মেয়েদের লেখা উপন্যাস: আধুনিকতার মাত্রা।

এখানে লিঙ্গ রাজনীতি-প্রসঙ্গে 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'এর পরিচিতি এবং অবস্থানের নিরিখে অনুরূপা দেবী, দীপ্তি ত্রিপাঠী, বাণী বসু এবং সেলিনা হোসেনের উপন্যাসগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী থেরীগাথার বিভিন্ন গাথা এবং প্রসঙ্গ ব্যবহার করে মেয়েদের বয়ানে নিজেদের কথা, অন্য মেয়েদের কথা কীভাবে উঠে এসেছে তার তুলনামূলক আলোচনা করেছি। বুদ্ধের কালে মেয়েদের অবস্থান ঠিক কেমন ছিল, এবং উপন্যাসগুলিতে সেই ঐতিহাসিক সত্য তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করেছি। আধুনিকতা কালনির্ভর, না বিষয় নির্ভর এই প্রশ্ন তুলেছি,- প্রাচীন থেরীগাথা আর মেয়েদের লেখা এই আধুনিক উপন্যাসগুলির বয়ানকে সামনে রেখে। আধুনিক সংরূপের বয়ান এবং অভিপ্রায়ও কি সবসময় 'আধুনিক' হয়? প্রাচীন থেরীগাথায় কোনো আধুনিকতা থাকা সম্ভব? বৌদ্ধযুগকে ব্যবহার করে স্রষ্টারা মেয়েদের কোন স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা দাবী-দাওয়ার কথা তুলতে চেয়েছেন? 'মেয়ে' এই লিঙ্গ পরিচয়ের অবস্থান থেকে তাঁরা বৌদ্ধযুগকে কীভাবে নির্ণয় এবং নির্ধারণ করতে চাইছেন? 'পুরুষতান্ত্রিক চিরাচরিত ফেমিনিন' এর ভাবনা প্রতিষ্ঠা করছেন না কি প্রতিবাদী স্বর তৈরি করছেন?

মেয়ে লেখকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ইতিহাসে এঁদের বক্তব্য কতখানি দায়িত্বপূর্ণ? আমরা মূলত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছি চতুর্থ অধ্যায়ে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পীতাতঙ্ক : ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, আখ্যানের তথ্য-তত্ত্ব।

বেশিরভাগ উপন্যাসে, আমরা বৌদ্ধধর্মকে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মানবতা ঔদার্য, ক্ষমাশীলতা, শোষিতের ক্ষমতাবিরোধী স্বর, শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ইত্যাদি ইতিবাচক প্রবণতায় ব্যবহৃত হতে দেখে এসেছি। কিন্তু উপন্যাসে বৌদ্ধতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা, বৌদ্ধমঠ-গুম্ফা ক্রিমিনালের আড্ডা, ব্যভিচারের আখড়া, কাষায় পরিহিত ক্ষমাশীল-উদার-পণ্ডিত-ধ্যানী-গম্ভীর শ্রমণেরা আসলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, ব্যভিচারি ক্রিমিনাল এরকম ভুরিভুরি কল্প-কাহিনিও আমরা পড়ি। সম্প্রতি এই ধরণের উপন্যাস বাজারে খুবই জনপ্রিয়। নগর-সমতলের গোয়েন্দা ‘বীর নায়কে’রা, বিপদসংকুল বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে এদের শায়েস্তা করে; গোঁড়া বৌদ্ধদের কবল থেকে তাদের ধর্মের দলিল-ঐতিহাসিক মূল্য যুক্ত দামী দ্রব্য, ‘উদ্ধার’ করে আনে...

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ, একটি ‘অভিজাত, সমতল এবং নগরকেন্দ্রিক হিন্দু আধিপত্য এবং প্রাধান্য (হেজমনি এবং ডমিন্যান্স) থেকে- ‘জাতি-ধর্ম-বর্ণ-এথনিসিটি-ভাষা-দেহ-বর্ণ’ ইত্যাদিকে ‘অপর’ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। তা আমরা আগের অধ্যায় গুলিতে আলোচনা করেছি। দেব-মূর্তি এবং মানুষকে ‘অপর’ বলে- ‘বিকট দর্শন’ বলে দাগিয়ে দেওয়া; ‘বেঁটে, ছোটো চোখ, হলুদ বর্ণ’... ইত্যাদি দৈহিক আকার থেকে এথনিসিটিকে ‘অপর’ করা। পার্বত্য এলাকা, চীন, জাপান, তিব্বত ইত্যাদি প্রাচ্যের বা ভারতের ভেতরের অংশ হলেও, প্রাচ্যে, ভারতে, বসেই তাকে ‘অপর’ এবং ‘ব্যঙ্গ’ করা- আমরা খেয়াল করব।

জটিল, ভৌগোলিক অবস্থান, জানার অসুবিধে, ‘অজানা- বিদেশ’ সম্পর্কে কৌতূহল থেকে কল্পনা এবং তা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত। পাঠকও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা, প্রাধান্যকামী, নগর-সমতলের

ভ্রমণবিলাসী। ফলে তাদের 'স্বপ্নপূরণের' খোরাক জোগানো হয় এই গল্পগুলির মাধ্যমে। ফেরার সময়, ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর মূর্তি কিনে আনে তারা। আর অন্তরে বহন করে, 'অপর' সম্পর্কে ভালো অথবা মন্দ এই বোধ, এবং সন্দেহ। অথচ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, অলকা চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখের সেখানে গিয়ে পুথিচর্চার গবেষণার যে অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে এই ভাবনাগুলি তেমন মেলে না। সত্য এবং কল্পনায় সচেতনভাবে এই ফারাককে নির্মাণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যাতে পারে, রাহুল সাংকৃত্যায়নের, *তিব্বতে সওয়া বছর,* বইটির মান এবং সত্যের কাছে এই উপন্যাসগুলি বেশীরভাগই নগণ্য মানের।

হঠাৎ সাহিত্যে এই প্রবণতা এল কোথা থেকে; এবং তা কি হঠাৎই এল, উপনিবেশের ছাপ কীভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্মীয় বিদ্বেষের বাইনারির সঙ্গে যোগ- ইত্যাদি প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে, ইতিহাস বিশ্লেষণ করে- ইউরোপ সৃষ্ট 'পীতাতঙ্ক' এর প্রকল্পের মধ্যে এর বীজকে খুঁজে পেয়েছি। পীতাতঙ্ক প্রভাবিত হয়ে, চীন জাপান, বার্মা ভারতবর্ষ অন্যান্য 'প্রাচ্যভূমিকে' তারা যে 'নেতিবাচক অপর এবং সন্দেহের' এর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে সেই প্রভাব সরাসর উপনিবেশ এবং উত্তর-উপনিবেশ পর্বের সাহিত্যিকদের ওপর পড়েছে। বরং দেশীয় স্মৃতিকথা, ভ্রমণসাহিত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন।

ফলে এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আমরা ইউরোপের 'পীতাতঙ্ক' প্রকল্পের ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, তথ্য সত্যকে বিশ্লেষণ করেছে। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের কথা খুব কমই এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়, পীতাতঙ্ক এবং বাংলা উপন্যাসের উত্তরাধিকার

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ইতিহাস, তথ্য ও সত্য, চিহ্ন এবং প্রবণতাগুলি ধারাবাহিকভাবে কীভাবে এই ধরণের বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে, সেই প্রভাবকে টিকিয়ে রাখার রাজনীতি কীভাবে

ক্ষমতার, মান্যতার পক্ষেই কথা বলে, সেগুলি বিশ্লেষণ করেছি। প্রসঙ্গক্রমে আছে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শশধর দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, প্রমুখের এই ধরণের উপন্যাসের বিশ্লেষণ। আমরা একেবারে বিশ শতকের কালপর্বে সীমাবদ্ধ না থেকে এই রাজনৈতিক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করতে করতে প্রায় সমকালের দু-একটি উপন্যাসেও উল্লিখিত হয়েছে।